গণ্ডগোল।

(ডিটেক্‌টিভ-গল্প)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. De, at the Bani Press.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1911.

গণ্ডগোল

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল কিন্তু সূর্য্যদেব তখনও দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। ফাল্গুন মাস, শীতের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। মৃদুমন্দ মলয় পবন প্রবাসীর দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বেল যুঁই মল্লিকাদি কুসুম-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। বসন্তাগমে বৃক্ষাদি নব পল্লবে আচ্ছাদিত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শিশিরবিন্দুচয় পত্র হইতে পত্রান্তরে পতিত হইয়া শ্রুতিমধুর অস্পষ্ট ধ্বনিতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

এ হেন সময়ে তিনজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কাশিমগঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভৈরবীর মন্দিরে উপনীত হইলেন। মন্দিরটী ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত—কাশিমগঞ্জের বিখ্যাত জমীদার শশাঙ্কশেখর সেই দেবী স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনার জন্য বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

মহিলাত্রয়ের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া—বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যৌবনে তিনি পরম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম সুহাসিনী—গৌরীপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী। দ্বিতীয়া বালিকা—বয়স বার বৎসরের অধিক নহে, দেখিতে অতি সুন্দরী, নাম চারুশীলা, সতীশচন্দ্রের একমাত্র সন্তান। অপরা যুবতী, বয়স প্রায় আঠার বৎসর। যৌবনের পূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ-নদীর কূলে কূলে প্লাবিতা—নাম রাধারাণী, সুহাসিনীর দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল চারুশীলা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়। সতীশচন্দ্র জমীদার—অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, এক-মাত্র কন্যার চিকিৎসার জন্য তিনি যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কোন ঔষধেই তাহার উপকার হইল না, কিছুতেই কন্যার রোগ সারিল না। অবশেষে দেবী ভৈরবীর স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধ ধারণ করিয়া চারুশীলা রোগ-মুক্ত হইল। এই কারণে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দিবার জন্য কন্যা ও ভগিনীকে

সঙ্গে লইয়া জমীদার-পত্নী সুহাসিনী সেদিন অতি প্রত্যুষেই দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গৌরীপুর গ্রাম কাশিমগঞ্জ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূর অবস্থিত। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই দেবীর পূজা সমাপ্ত হয় শুনিয়া তাঁহারা পূর্ব্বদিনেই গৌরীপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কাশিমগঞ্জে এক পরিচিত লোকের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষেই দেবী মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে আসিতে সতীশচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার এমন কাজ পড়িল যে, তিনি কোন মতেই সেদিন বাটীর বাহির হইতে পারিলেন না। অগত্যা দুইজন বলিষ্ঠ দ্বারবানের সঙ্গেই তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে জমীদার পত্নী সকলকে লইয়া পূজারি ব্রাহ্মণের বাসা-বাটীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ সেদিন যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন! সুহাসিনী ও সঙ্গিনীগণের অভ্যর্থনার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। যাহাতে তাঁহাদের কোন রূপ কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেন।

যে দুইজন দ্বারবান তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা রাজপুত ব্রাহ্মণ, অপর লোকের হস্তে আহার করে না বলিয়া সুহাসিনী তাহাদিগকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন এবং তদুপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। দ্বারবানদ্বয় হৃষ্টচিত্তে আপন আপন খাদ্য সামগ্রী পাক করিতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুহাসিনী, কন্যা ও ভগিনীর সহিত আহার করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু দ্বারবানদ্বয়ের পাক-শাক তখনও শেষ হয় নাই। বিলম্ব দেখিয়া রমণীত্রয় মাঠের শোভা সন্দর্শনার্থ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে ভ্রমণার্থ বাহিরে যাইতে দেখিয়া অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং সত্বর প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সুহাসিনীও ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই নিকটস্থ এক বিস্তীর্ণ মাঠে প্রবেশ করিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া তাঁহারা পথ ভুলিয়া গেলেন। যে পথ দিয়া তাঁহারা মাঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে পথ তাঁহারা সকলেই বিস্মৃত হইলেন এবং যতই সে স্থান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া

এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুহাসিনী অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের উপদেশ যেমন অবহেলা করিয়াছিলাম, তেমনই তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছি। বেলা প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল, আমরা যে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি তাহাও জানিবার উপায় নাই। আমাদের দুজনের জন্য বিশেষ ভাবি না কিন্তু চারুশীলার কি হইবে? মা আমার শৈশবাবধি কষ্টের নাম মাত্র জানে না, সে আজ কেমন করিয়া এই নির্জ্জন মাঠে রাত্রি যাপন করিবে।

রাধারাণী এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। কিন্তু সুহাসিনীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন দিদি, এত ভাবিতেছ? সেই দরোয়ান দুই-জনই ত নষ্টের মূল। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাহাদের আহার শেষ হইয়াছে, হয় ত এখনই আমাদের খোঁজ পড়িবে। যখন পূজারি ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের সহায়, তখন এত চিন্তা কেন? তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অন্বেষণে লোক জন পাঠাইয়া দিবেন।"

চারুশীলা মায়ের কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়াছিল, মাসীমার কথায় তাঁহার সাহস হইল, মুখে হাসি ফুটিল। সে বলিল, সত্যই ত, আমাদের সঙ্গে যে দুইজন দরোয়ান আসিয়াছে, তাহারা কি আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে আসিবে না? তাহারা কি আমা-দিগকে না লইয়া বাড়ীতে ফিরিতে পারিবে?

কন্যা ও ভগিনীর কথায় সুহাসিনীরও সাহস হইল। তিনি বলিলেন, তবে আর এখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে—চল, আমরা আরও একটু অগ্রসর হই। দেখি, পথ বাহির করিতে পারি কি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সর্দ্দার! একটা বড় কাৎলা দেখা দিয়াছে, কিন্তু—

"কিন্তু কি রে সদা! কথাটা ভেঙ্গেই বল।"

সদানন্দ ঈষৎ হাসিল। একবার চারি-দিক ফিরিয়া দেখিল। পরে বলিল, কাৎলা বটে কিন্তু মেয়েমানুষ।"

সর্দ্দার অট্টহাস্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, অনেক দিন শীকার পাওয়া যায় নাই। রোজ রোজ খালি হাতে বাড়ী ফিরিলে তোদের সর্দ্দারনি আমায় দূর করে দেবে। মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, তুই খবর নিয়ে আয়, ভগবান যখন আজ শীকার পাঠিয়েছেন, তখন কিছুতেই ছাড়া হবে না।

সর্দ্দারের হুকুম পাইলেও সদানন্দ

দাঁড়াইয়া রহিল। অবনত মস্তকে সে যেন কি ভাবিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিল, "এত দিন তোমার চেলাগিরি করিতেছি, কই একটী দিনও ত এমন হুকুম দাও নাই সর্দ্দার! বরং আমরা ওকথা তুলিলে তুমি আমাদের উপর রাগ করিতে। আজ কেন তোমার এ ভাব?"

সদানন্দের প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাহার কার্য্যে অবহেলা দেখিয়া সর্দ্দার ভয়ানক রাগান্বিত হইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিছুক্ষণ সে কোন কথা কহিল না। পরে বজ্রনির্ঘোষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সদা! আমার হুকুম তামিল করবি কি না?

বিনা মেঘে অশনিপাত হইলে পথিক যেমন মুগ্ধ হয়, সর্দ্দারের কথা শুনিয়া সদানন্দ ততোধিক স্তম্ভিত হইল। সে মুখে কোন কথা না বলিয়া সর্দ্দারের সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সর্দ্দার তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় বলিল, "যদি ভাল চাস্, যা' বলেছি এখনই কর।"

সদানন্দ আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। সে সর্দ্দারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পরে সহসা তাহার পদতলে পতিত হইয়া দুই হস্তে পদধূলি গ্রহণ করতঃ আপনার মস্তকে প্রদান করিল। তাহার পর নিমেষমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এত শীঘ্র সে এই সকলকার্য্য সম্পন্ন করিল যে, সর্দ্দারের আন্তরিক ইচ্ছা হইলেও সে তাহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিল না।

সদানন্দ প্রস্থান করিলে পর সর্দ্দার সম্মুখস্থ একটী প্রকাণ্ড আম্র-বৃক্ষতলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সদানন্দ ফিরিয়া আসিলে সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি সদা?"

যতক্ষণ তাহার সে কার্য্যে মন ছিল না, ততক্ষণ সদানন্দ তাহা সম্পন্ন করিবার কোন প্রকার উপায়েরই চেষ্টা করে নাই। কিন্তু এখন তাহার মতি ফিরিয়াছে; তাই সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "যা' বলেছি ঠিক তাই। তিন জন স্ত্রীলোক, সঙ্গে পুরুষ নাই। ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্টই বুঝা যায়, পথ ভুলেছে। এই দিকে আস্‌ছিল সহসা কি মনে ক'রে ফিরে গেল। এখন বোধ হয় তারা এখান থেকে আধ ক্রোশ দূরে আছে।"

স। বেশ কথা—কিন্তু আসল কথা কি? কিছু আছে?

সদা। আর কিছু না থাক্, গায়ে গহনায় হাজার কতক টাকা হ'তে পারে মেয়েটা ত সোনায় মোড়া।

সর্দ্দার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল, "বলিস্ কি? তবে আরদেরি কেন? শেষে কি আপশোষ করবো?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ বলিল, "আর একজন লোক চাই।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তিনটে মেয়ে মানুষকে সাবাড় করতে আরও লোকের দরকার?

বাধা দিয়া সদানন্দ বলিল, কাজটা যাতে নিঃশব্দে হাসিল হয়, তাই আমার চেষ্টা। একেবারে তিনজনে তিনজনকে আক্রমণ কর্‌লে কেউ আর চেঁচাতে পার্‌বে না।

সর্দ্দার কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে বলিল, "বেশ কথা—রত্‌নাকে ডেকে নিয়ে আয়। সেটা কাজের লোক—সহজে এ কাজটা হাসিল কর্‌তে পারবে।"

সদানন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ যুবকের সহিত ফিরিয়া আসিল। নবাগতকে দেখিয়া সর্দ্দার অল্প কথায় সকল ব্যাপার বুঝাইয়া দিল। পরে তিন জনে পৃথক ভাবে তিন দিকে গমন করিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে গমন করিলে রমণী-তাহাদের নয়নগোচর হইল। সর্দ্দার তখন তাহার দুইজন শিষ্যকে সঙ্কেত করিয়া নিকটে ডাকিল এবং প্রত্যেককে এক এক-জন রমণীর ভার দিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট স্ত্রী-লোকের ভার গ্রহণ করিল।

স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে পর সর্দ্দার রমণীগণকে আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল। নিমেষ মধ্যে তিন জনে তিনজন রমণীকে আক্রমণ করিল।

একে দুর্ব্বল রমণী অসহায়া, তাহার উপর সহসা আক্রান্ত হওয়ায় সকলেই হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। দস্যুগণ তাহাদিগের গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে অদূরে অশ্বের পদশব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। সর্দ্দার ও তাহার শিষ্যগণ সে শব্দে চমকিত হইল। যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা করিতে আর সাহস হইল না। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফল ত্যাগ করিয়া যাইতেও তাহাদের মন সরিল না।

শব্দের গতি বুঝিয়া তাহারা দেখিল, একজন অশ্বারোহী অতি দ্রুত বেগে তাহাদেরই দিকে আগমন করিতেছে। সর্দ্দার সদানন্দের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। শিষ্যদ্বয় সে হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল এবং তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

নিমেষ মধ্যে অশ্বারোহী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুসর্দ্দার ও তাহার শিষ্যদ্বয় আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই ভূমিতলে লম্ফ প্রদান করিয়া সর্দ্দারের ললাটে ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে সবলে এমন এক আঘাত করিলেন যে, সে তদ্দণ্ডে শব্দ মাত্র না করিয়া হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সর্দ্দারের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার

চেলা দুইজন কি করিবে স্থির করিতে না করিতে অশ্বারোহী সদানন্দের ললাটেও সেইরূপ আর একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; সেও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তৃতীয় দস্যু রত্না পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল অশ্বারোহী বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকেও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের দশায় আনয়ন করিলেন।

তিনজনকে হতচেতন দেখিয়া অশ্বারোহী সত্বর কিয়দংশ অশ্বরজ্জু কাটিয়া লইলেন এবং তদ্দ্বারা তিন জনকে এমন দৃঢ়রূপে একটা গাছের সহিত বন্ধন করিলেন যে, তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া সবলে চেষ্টা করিলেও কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না।

এইরূপে দস্যু তিনজনকে বন্ধন করিয়া তিনি রমণীত্রয়কে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। অনেক কষ্টে বালিকার মোহ অপনীত হইল। কিন্তু সুহাসিনী বা তাঁহার ভগ্নী সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়ায় সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না।

চারুশীলা জ্ঞান লাভ করিলে পর অশ্বারোহী একবার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। যাহা দেখিলেন, তেমন রূপ তিনি আর কখনও নয়নগোচর করেন নাই। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

ইত্যবসরে সুহাসিনী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। অশ্বারোহী তখনই আত্মসংবরণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে গমন করিলেন এবং বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত। চারুশীলা এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, তাহার অবস্থা দেখিয়া অশ্বারোহী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে অতি সামান্য মাত্র আঘাত পাইয়াছিল। সুহাসিনীকে সচেতন দেখিয়া বালিকা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং মায়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে পারিল ও চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অশ্বারোহী বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। তিন জন আহতা রমণী তাঁহার সম্মুখে, তিন জন দুর্দ্দান্ত দস্যু বদ্ধাবস্থায় এক বৃক্ষের তলে, এ সকল ত্যাগ করিয়া তিনি কেমন করিয়া নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে সুহাসিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চারু! আমার কন্যা কোথায়? হরি! হরি! কেন আমরা বেড়াইতে আসিয়াছিলাম?"

চারুশীলা নিকটেই ছিল। সে মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ স্বর শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই যে আমি—মা! তুমি কি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমারই নিকটে আছি মা! কেন মা তুমি এমন করিতেছ?"

কন্যার কণ্ঠস্বর সুহাসিনীর কর্ণগোচর হইল। তিনি চারুশীলাকে জীবিতা জানিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বোধ হইল তিনি তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধা গেল কোথায়? সে কেমন আছে?"

রাধারাণীর মোহ তখনও অপনীত হয় নাই। চারুশীলাই মায়ের কথায় উত্তর দিল। বলিল, "মাসীমার এখনও জ্ঞান হয় নাই। তিনি মড়ার মত পড়িয়া আছেন।

চারুশীলার শেষ কথাগুলি বোধ হয় সুহাসিনীর কর্ণগোচর হইল না। তিনি পুনরায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পুনরায় জ্ঞান-সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখেই অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইলেন এবং তখনই সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন। অশ্বারোহী সুহাসিনীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, শশব্যস্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুহাসিনী একবার অশ্বারোহীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "আপনি কে? চারুর কি হবে?"

যেরূপ কষ্টের সহিত সুহাসিনী ঐ কথা-গুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে অশ্বারোহী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি ম্লানভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই—আমাকে আপনার বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। আমি একজন উকিল---বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ অশ্বারোহণে এই মাঠ দিয়া যাইতে ছিলাম। দূর হইতে তিনজন দস্যুকে আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া দ্রুতগতি এখানে আসিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় দস্যু তিনজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঐ দেখুন, তাহাদিগের হস্ত পদ আবদ্ধ করিয়া ঐ বৃক্ষের তলে রাখিয়াছি। এখন তাহারাও অচেতন, সুতরাং পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই।"

সুহাসিনী একবার নির্দ্দিষ্ট দিকে লক্ষ্য করিলেন। বোধ হয় দস্যুগণ তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। তাঁহার মুখে অল্প হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। পরে অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকিল বলিলেন?"

অশ্বারোহী বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ. আমার নাম কালীচরণ মুখোপাধ্যায়। যদি আপনারা আর কিছুক্ষণ এখানে এ অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে আমি সত্বর একজন ডাক্তার আনিতে পারি।"

সুহাসিনী যেন কি চিন্তা করিলেন।

পরে বলিলেন, "না—ততক্ষণ বাঁচিব না। আর হয়ত দেখা হবে না।"

অশ্বারোহী আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমি কি করব বলিয়া দিন। যদি কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলুন, আমি এখনই প্রস্তুত আছি।"

অশ্বারোহীর কথায় সুহাসিনীর মুখে হাসি আসিল। ক্ষণেকের তরে যেন তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব হইল। তিনি যেন কিছু বল পাইলেন। স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, আমার একমাত্র কন্যার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার জন্য যদি কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করি, তাহা হইলে চারুশীলা কিছুই পাইবে না। তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, তাহার নামে উইল করিয়া যাই। সৌভাগ্যক্রমে এ বিপদের সময় আপনি উপস্থিত আছেন। অল্প কথায় একখানি উইল করিয়া দিন, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

অশ্বারোহী সম্মত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই সমস্ত সরঞ্জাম ছিল, পকেট হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া তিনি তখনই একখানি উইল লিখিয়া ফলিলেন।

উইল লেখা শেষ হইলে অশ্বারোহী সুহাসিনীকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। মুমূর্ষু হইলেও তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল।

উকিল বাবু কলমটী সুহাসিনীকে স্পর্শ করাইয়া স্বয়ং তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিলেন। পরে কাগজখানি চারুশীলার হস্তে প্রদান করিয়া যেমন সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার দৃষ্টি স্থির। তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখনই তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। চারুশীলা চীৎকার ক'রয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাধারাণী তখনও অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। চারুশীলা তাঁহাকেও মৃতা বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। দস্যু তিনজন তখনও হতচেতন। সম্মুখে সুহাসিনীর মৃতদেহ। অশ্বারোহী বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, তখনই নিকটস্থ থানায় সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু কেমন করিয়াই বা চারুশীলাকে সে অবস্থায় রাখিয়া গমন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেক কষ্টে চারুশীলাকে শান্ত করিয়া অশ্বারোহী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চারুশীলা অশ্বারোহীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গৌরীপুরের জমীদার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা। আমরা এখানে ভৈরবীর পূজা দিতে আসিয়াছিলাম।"

উকিল বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, জমীদার পত্নী লোকজন না লইয়া

এত দূরে আসিলেন কেন? কিন্তু সে কথা চারুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

তাঁহাকে নীরব ও চিন্তিত দেখিয়া চারুশীলা বোধ হয় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। সে বলিল, "আমাদের সঙ্গে যে লোক আসিয়াছিল, তাহাদের আহার হয় নাই বলিয়া আমরা তিনজনে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে পথ ভুলিয়া যাই। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে এই দশা হয়।

অশ্বারোহী চমকিত হইয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! মন্দির হইতে তোমরা যে প্রায় দেড় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছ। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী থানাও প্রায় এক-ক্রোশ। সুতরাং মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা থানার দিকে যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু একা তোমায় এতগুলি অচেতন ও মৃত লোকের মধ্যে রাখিয়া যাইতে সাহস হইতেছে না। কি জানি, ইতিমধ্যে যদি আবার কোন বিপদ ঘটে।

রাখিয়া যাইবার কথা শুনিয়া চারুশীলা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "না—না—আমায় এখানে রাখিয়া যাইবেন না। আমি একা থাকিতে পারিব না।"

যেরূপ নম্রতার সহিত চারুশীলা ঐ কথাগুলি বলিল, তাহাতে কালীচরণ বিচলিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। থানায় সংবাদ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু কেমন করিয়াই বা বালিকা চারুশীলাকে সেখানে রাখিয়া যান। তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে চারুশীলাকে সঙ্গে করিয়াই থানায় যাইতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুসারে বলিলেন, "যদি এখানে একান্ত না থাকিতে চাও, তাহা হইলে তোমায় আমার সহিত যাইতে হইবে। আমার পার্শ্বে ঘোড়ার উপরে বসিতে হইবে—পারিবে ত?"

চারুশীলা অতি বিনীত ও সলজ্জ ভাবে উত্তর করিল, "আমি পূর্ব্বে অনেকবার ঘোড়ায় উঠিয়াছি—বিশেষ ভয় করে না। জমীদারের একমাত্র কন্যা, যাহা আবদার করিয়াছি তাহাতেই পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন।"

উকিল বাবু আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে চারুশীলাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন এবং এক হস্তে অশ্বরজ্জু অপর হস্তে বালিকাকে ধারণ করিয়া নিমেষ মধ্যে মাঠ পার হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে পর বালিকা হতচেতন হইয়া পড়িল। তিনি

তাহার অচেতন দেহ বক্ষে দৃঢ় ধারণ করিয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উকিল বাবু চারুশীলাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পর দস্যু তিনজনের মধ্যে একজনের জ্ঞান সঞ্চার হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চারিদিক অবলোকন করিল। দেখিল, সম্মুখে দুইটী অচেতন দেহ, আর দেখিল তাহার ও তাহার বন্ধুদ্বয়ের হস্ত-পদাদি এরূপ দৃঢ় ভাবে সেই বৃক্ষের সহিত আবদ্ধ যে, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন সে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন সে অপর দুই বন্ধুর মোহ অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া নিতান্ত হতাশভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা তাহার মনে কি নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। সে অতি উচ্চস্বরে তিন-বার শিশ দিল। কিছুক্ষণ পরে অদূরে তাহার অনুরূপ আর তিনবার শিষ কর্ণ-গোচর হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দূর হইতে বৃক্ষতলে দস্যুত্রিতয়কে সেই প্রকার আবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া রমণী কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিল। তাহার শাণিত চাকচিক্যময় ফলকে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হইতে লাগিল। রমণী সেই ছোরা তুলিয়াই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কোন কথা না বলিয়া তখনই তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

ইত্যবসরে অপর দস্যুদ্বয়ও সংজ্ঞালাভ করিল। তখন তিনজনেই দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু সকলের পলায়ন করিবার সামর্থ্য ছিল না। সর্দ্দার এরূপ আহত হইয়াছিল যে, তাহার নড়িবার ক্ষমতা ছিল না।

রমণী যখন সর্দ্দারের অক্ষমতা বুঝিতে পারিল অথচ দেখিল যে, তাহার শিষ্য দুইজন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিবার কোন চেষ্টা করিতেছে না, তখন সে অতি কর্কশ ভাবে বলিয়া উঠিল, "ধিক্ তোদের জন্মে। সর্দ্দারের এমন অবস্থা দেখেও তোরা নিশ্চিন্ত আছিস? ছি—ছি, যদি ভাল চাস, এখনই উহাকে দুইজনে কাঁধে ল'য়ে এখান হ'তে পলায়ন কর।"

রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে সদানন্দ ও রত্না সর্দ্দারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষ মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। রমণী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীর বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। তাহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণা ও হৃষ্টপুষ্টা। অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি সুন্দর। মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নহে। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল, অচেতন রমণীদ্বয়ের অলঙ্কার স্পর্শ না করাই ভাল। সে একবার অচেতন রমণীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সদানন্দ ও তাহার সঙ্গী বিশেষ আহত হয় নাই, তাহারা অতি শীঘ্রই সর্দ্দারকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা তাহার আহত-স্থানগুলির পরিচর্য্যা করিতেছে, এমন সময়ে সর্দ্দার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "রাজু বড় সহজ মেয়ে নয়। সে যে খালি হাতে ফিরবে এমন ত বোধ হয় না।"

বাধা দিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই না—সে নিশ্চয়ই খানকয়েক দামী গহনা যোগাড় ক'রে এনেছে। এখন শীকার আমাদের, কষ্ট আমাদের, আর লাভের বেলা রাজু! এ কথা বড় ভাল নয়।"

রত্‌নাও এ কথায় সায় দিল। তখন সর্দ্দার বলিল, "এক কাজ করা যা'ক, ভায়াকে ডেকে এ বিষয়ে সন্ধান কর্‌তে বলে দেওয়া যা'ক্. রাজু যদি সত্য সত্যই কিছু যোগাড় ক'রে থাকে, সকলেই অবশ্য তার অংশ পাবে।"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। সদানন্দ সেইখানে বসিয়া সর্দ্দারের সেবা করিতে লাগিল। রত্‌না দ্রুতগতি তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে আর একজন বলিষ্ঠ লোককে লইয়া পুনরায় সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, দামু. এতক্ষণ কোথায় ছিলি ভাই! একটা বড় শীকার হাতে পড়ে পালিয়ে গেল, তুই কাছে থাক্‌লে আজ অনেক টাকা লাভ হ'তো।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দামোদর ওরফে দামু উত্তর করিল, "কোথাও যাই নাই—আজ সকাল থেকে রাজুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাই তার সন্ধান কর্‌ছিলাম।"

সর্দ্দার চমকিত হইল। সে শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "সে কি! রাজু ছিল বলে আজ আমরা বেঁচে এসেছি। সে না থাক্‌লে আমাদের যে কি দশা হতো বলা যায় না।"

এই বলিয়া সর্দ্দার অতি মৃদুস্বরে সকল কথা ব্যক্ত করিল। দামু শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং রাজুর সাহসের বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিল।

রাজু ওরফে রাজবালা দামোদরের প্রণয়িণী। দামোদর তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজবালার কুটীরে গমন করে এবং

পরদিন অতি প্রত্যুষেই আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করে। রাজবালার উপর অনেকেরই লোভ ছিল, কিন্তু সর্দ্দারের প্রতি—দামোদরের ভয়ে আর কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, "দামু! একটা কাজ তোকে এখনই করতে হবে।"

দা। কি কাজ দাদা? হুকুম কর—এখনই হাসিল করবো।

স। একবার রাজুর কাছে যা।

দামোদর মুচকি হাসিয়া বলিল, "না দাদা, তামাসা নয়। তোমার হুকুম আমি কখনও অমান্য করি নাই।"

দামোদরের কথা শুনিয়া সর্দ্দার হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "না ভাই! আমি ত সে কথা বলি নাই। সত্য সত্যই তোকে এখনই একবার রাজুর বাড়ীতে যেতে হ'বে।"

দামোদরও হাসিতে হাসিতে বলিল, "কবে না যাই দাদা! গিয়ে কি করবো?"

স। রাজু নিশ্চয়ই সেই মাগীদের কাছ থেকে খানকতক গহনা এনেছে। সেই গহনাগুলি চাই।

দা। সে যদি না দেয়?

স। জোর ক'রে কেড়ে আনবি।

দা। সে কি দাদা—রাজুর উপর এত কড়া হুকুম দিলে চলবে কেন?

স। গহনাগুলি সে এনেছে বটে কিন্তু আমরাই ত আগে সেই মাগীদের ঘাল করি। আর আমরাই শেষে ফাঁকিতে পড়বো! তুই কি বলিস্?

দামোদর কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "না দাদা, সেটা ভাল হয় না। আমি এখনই রাজুর কাছে যাচ্ছি, যদি কিছু এনে থাকে, এখনই এখানে আনছি।"

এই বলিয়া দামোদর তথা হইতে প্রস্থান করিল। সদানন্দ ও রতনা পুনরায় সর্দ্দারের সেবায় নিযুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দামোদর যখন রাজুর কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন বেলা চারিটা। আপন কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজু তখন রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দামোদর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

রাজবালা বালবিধবা। বিবাহের তিন দিন পরে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। শৈশবকালেই তাঁহার পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। এক দূরসম্পর্কীয় পিতৃস্বসাই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু রাজুর দুর্ভাগ্যবশতঃ সেও মারা পড়ে। রাজুর বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র। এক প্রতিবেশী তাহাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করে এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহার বিবাহ দেয়।

বিধবা হইবার চারি বৎসর পরে রাজু শ্বশুরবাড়ী হইতে পলায়ন করে। সেই সময় হইতেই সে দামোদরের সুনজরে পতিত হয়। সেইদিন হইতেই দামোদর তাহার ভরণ-পোষণ ভার গ্রহণ করে এবং তাহার বাসের জন্য নিজ ব্যয়ে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

দামোদর প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই কুটীরে যাইত এবং প্রত্যূষেই তথা হইতে প্রস্থান করিত। সেদিন বেলা চারিটার সময় তাহাকে কুটীরে দেখিয়া রাজবালা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ অসময়ে যে দাসীকে মনে পড়েছে? কি ভাগ্যি!"

দামোদর কোন উত্তর না করিয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া রাজবালার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। তাহার প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হইল। সে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞসা করিল, "কি হয়েছে গা—বল না? মুখ ভার কর্‌লে কেন?"

রাজবালাকে দামোদর আন্তরিক ভালবাসিত। যেরূপ মিনতি করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাতে দামোদরের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ সকাল থেকে ছিলি কোথায়?

দামোদরকে হাসিতে দেখিয়া রাজবালার ভয় গেল, সেও হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, বাড়ীতেই ছিলুম।"

দামোদর উপহাস বুঝিতে পারিল না। সে পুনরায় রাগান্বিত হইয়া বলিল, "কখনও না, যদি তাই হয়, তবে তুই এখন রাঁধছিস্ কেন?"

রাজবালা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিনির ছেলে হয়েছে—দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "বিনি কে? সদানন্দের স্ত্রীর নাম কি বিনি? তবে কি আমাদের সদার ছেলে হয়েছে?"

রাজবালা হাসিয়া সম্মতিসূচক উত্তর দিল। তখন দামোদর বলিল, কই—সদা ত সে কথা কিছু বল্‌লে না? কথাটা চেপে গেল—না?"

রা। সে কথা আর বল্‌তে। কিন্তু আমি না থাক্‌লে ছেলের বাপকে যে চৌদ্দ বচ্ছর জেলে যেতে হতো। তোমার দাদাও যে তার মধ্যে ছিল। সেই বেশী চোট খেয়েছে।

দা। সে সব কথা শুনেছি। এখন গহনাগুলো দে। ভাল কথা মনে করেছিস্।

রাজবালা স্তম্ভিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গহনাগুলো কি? কার গহনা?"

দামোদর কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ন্যাকা আর কি! দাদারা চলে আস্‌বার

পর তুই সেই মাগীদের কাছ থেকে যে গহনাগুলো এনেছিস্, সেইগুলো দে, এখন বুঝতে পেরেছিস্?"

রা। আমি একখানিও গহনা আনি নাই।

দামোদর অট্টহাস্য করিল। সে বলিল, "ও সকল কথা এখন রেখে দে। আমার দাদাকে চিনিস্ত? তার হুকুমের জোর জানিস্ত?"

রাজবালা তখন অতি বিনীতভাবে বলিল, "তোমার দিব্যি করে বল্‌ছি, আমি তাদের গহনা ছুঁই নাই। আমি অমন কাঁচা কাজ করি না। সে সকল দামী জিনিষ বিক্রী কর্‌তে গেলেই ধরা পড়তে হবে। সেই ভয়ে আমি আনি নাই। তোমার বিশ্বাস না হয় আমার ঘর খুঁজে দেখ।"

দামোদর রাজবালার এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তখনই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

দস্যু সর্দ্দার যখন এই সকল কথা শুনিতে পাইল, তখন সে দামোদরের উপর ভয়ানক রাগান্বিত হইল। দুই ভ্রাতায় বিষম বচনা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় বিবাদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তখন উপস্থিত লোকেরা দুই ভ্রাতাকে দুই স্থানে পৃথক করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিল। দামোদর সেই দিন হইতে ভাইয়ের অধীনতা ত্যাগ করিল এবং আপনার যথা সর্ব্বস্ব বুঝিয়া লইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কালীচরণ যখন চারুশীলাকে লইয়া অশ্বারোহণে কাশিমগঞ্জের থানায় উপস্থিত হইলেন, তখন চারুশীলা সম্পূর্ণ অচেতন। থানার লোকেরা তাহাকে মৃতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু কালীচরণ তাহাদিগকে অল্প কথায় সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখনই চারিজন চৌকদার তাঁহার নিকট আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে চারুশীলার অচেতন দেহ নামাইয়া লইল।

অপর এক জনের হস্তে অশ্বরজ্জু প্রদান করিয়া কালীচরণ এক লম্ফে ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং তখনই দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন

দারোগা বাবু তাঁহার নিকট হইতে সেই ভয়ানক সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। অপর কোন লোকের মুখে শুনিলে তিনি কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু কালীচরণের পরিচয় পাইয়া বিশেষতঃ তাঁহাকে একজন উকিল জানিতে পারিয়া তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন

না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কয়জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন?"

কালীচরণ উত্তর করিলেন, "তিনজন।"

দা। কোথায় তাহারা?

কা। সেই মাঠেই একটী গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

দা। আপনি একা তিনজন বলিষ্ঠ দস্যুকে কেমন করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন?

কালীচরণ আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "সে সকল কথা পরে জানিতে পারিবেন। আপাততঃ একজন ডাক্তার লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুন। একজন ইতিপূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছেন, অপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন।"

দারোগা বাবু আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি সত্বর একজন ডাক্তারকে লইয়া কালীচরণের সহিত যথাস্থানে গমন করিলেন।

দস্যুগণকে যেরূপে সেই বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহাতে কালীচরণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তখনও তাহারা সেই অবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্তু দূর হইতে যখন তিনি সেই বৃক্ষতলে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দস্যুগণের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। যে রজ্জু দ্বারা দস্যুগণ আবদ্ধ ছিল, সেই রজ্জু খণ্ড খণ্ড হইয়া তথায় পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

দুইটী অচেতন রমণী দেহ যথাস্থানেই পতিত ছিল। দারোগা বাবু দস্যুগণকে না দেখিতে পাইলেও কালীচরণের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ যে অপর কোন লোকের সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখনই ডাক্তার বাবুকে অচেতন দেহ দুইটী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু তদনুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একজন প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছেন। অপরা তখনও জীবিতা বটে কিন্তু যদি এক ঘণ্টার ভিতর চৈতন্য না হয় তাহা হইলে তাহার জীবনও সঙ্কটাপন্ন।

দারোগা বাবু তখন সত্বর দুইটী দেহ দুই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া কালীচরণের সহিত পুনরায় থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। থানায় গিয়া দেখিলেন, চারুশীলার জ্ঞান হইয়াছে, সে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কালীচরণ বাবু তাহাদের বাড়ী চিনিতেন। তিনিই চারুশীলাকে লইয়া সন্ধ্যার পর গৌরীপুরের জমীদার

সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সতীশচন্দ্র এতক্ষণ স্ত্রী-কন্যার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন, কন্যাকে একজন অপরিচিত যুবকের সহিত গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং কালীচরণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালীচরণ অল্প কথায় সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ও শ্যালিকার সাংঘাতিক আহত হওয়ার কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হ লেন এবং কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

সতীশচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া কালীচরণ তথা হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি চারুশীলার মায়ের শেষ উইলখানি সতীশচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সতীশচন্দ্র উইল দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, সেইদিন হইতে তিনি কালীচরণকেই আপনার পারিবারিক উকিল বলিয়া স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাধারাণী হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সতীশচন্দ্র স্ত্রীর শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, রাধারাণীকে দেখিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

দস্যু তিনজনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সতীশচন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। তিন চারিজন ভাল ভাল গোয়েন্দা সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দস্যুগণকে কেহই গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। অবশেষে আরও কিছুদিন পুলিসের লোকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার পর সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। যে সকল দস্যু এই প্রকারে নারী হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আর ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে সতীশচন্দ্রের পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার শ্যালিকা রাধারাণী এখন সে বাড়ীর গৃহিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীর কোন কার্য্যই রাধারাণীর পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

চারুশীলা এতকাল মায়ের আদরে ও পিতার যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহাকেও রাধারাণীর অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়। সতীশচন্দ্রের দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রও রাধারাণীর বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না।

সতীশচন্দ্রের পুত্র ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা চারুশীলাই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু জমীদারী

তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি, চারুশীলা সে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না।

সতীশচন্দ্রের দুই জন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম গৌরীশঙ্কর, কনিষ্ঠের নাম হরশঙ্কর। সতীশচন্দ্র হরশঙ্করকেই অধিক ভাল বাসিতেন। হরশঙ্করও তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন, এই সকল কারণে তিনি হরশঙ্করকেই বিষয়ের অধিকাংশ প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

গৌরীশঙ্কর স্বয়ং এ সকল ব্যাপার জানিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কনিষ্ঠের উপর কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই। উভয়ের মধ্যে তিনিই সচ্চরিত্র, উদার ও অমায়িক। তিনি সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহেন। কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। কি বড় কি ছোট, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। এত গুণ সত্ত্বেও তিনি সতীশচন্দ্রের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

সুহাসিনীর মৃত্যুর পর হইতে সতীশচন্দ্রও রাধারাণীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িলেন। সুহাসিনীর জীবদ্দশায় ইচ্ছা থাকিলেও সতীশচন্দ্র রাধারাণীর সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। সুহাসিনী যে স্বামীকে কোনরূপ অবিশ্বাস করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাকে এরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, সতীশচন্দ্র কোন দিন রাধারাণীর সহিত বাক্যালাপ করিতে সুবিধা পান নাই।

সুহাসিনী সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু রাধারাণীর বয়স অল্প বলিয়া উভয়ের মধ্যে তাঁহাকে অধিক সুন্দরী বলিয়া বোধ হইত। এবং এই কারণেই সুহাসিনী রাধারাণীকে সর্ব্বদাই নজরে রাখিতেন।

রাধারাণীর সহিত সুহাসিনীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে সুহাসিনী তাঁহাকে চিনিতেন না। এক দিন সুহাসিনী প্রত্যূষে স্নান করিয়া নদী হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে রাধারাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাড়ীর একজন বৃদ্ধা দাসী সুহাসিনীর সঙ্গে গিয়াছিল। রাধারাণীকে দেখিয়া সেও দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণীকে দেখিতে অতি সুন্দরী—বিশেষতঃ যৌবনে তাহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুন্দরী যুবতীকে পথে ঘুরিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখে তাহার ভয়ানক দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া সুহাসিনীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি রাধারাণীকে আপন ভগ্নী সম্বোধন করিলেন এবং তখনই নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে মনস্থ করিলেন। যে দাসী সুহাসিনীর সহিত গিয়াছিল, সেই কেবল রাধারাণীর প্রকৃত পরিচয় জানিত। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সেও

অল্প দিনের মধ্যেই মারা পড়িল। সুতরাং বাড়ীর আর কোন লোকই জানিত না যে, রাধারাণী সুহাসিনীর প্রকৃত ভগ্নী নহে।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। কিন্তু যতই দিন কাটিতে লাগিল, রাধারাণীর ক্ষমতাও ততই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন, দাস দাসীগণ আর তাঁহার দৌরাত্ম সহ্য করিতে পারিল না। একে একে দুই তিনজন দাসী সতীশচন্দ্রের বাড়ী হইতে দূরীভূত হইল। সতীশচন্দ্রও রাধারাণীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে একদিন হরশঙ্কর আহারাদির পর সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "জেঠা মহাশয়! আমার এক বন্ধু এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, আমাদের এই বাড়ীতেই কিছুদিন বাস করেন। যদি আপনার অনুমতি পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

হরশঙ্কর যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন রাধারাণীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সতীশচন্দ্র কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি উপযাচক হইয়া বলিলেন, "বেশ ত! এ ত গৌরবের কথা! তোমার বন্ধু এদেশে আসিয়া যদি অপর বাড়ীতে থাকেন, তাহা হইলে তোমারই লজ্জার কথা। তুমি এখনই তাঁহাকে [illegible] আসিতে বল। আমাদের ঘরের অভাব নাই; একটী কেন, চারিজন বন্ধু আসিলেও সকলের স্থান দিতে পারি।"

রাধারাণীর কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা করিতেছিলে কেন? তুমি ত অনায়াসেই তাঁহাকে এখানে আনিতে পারিতে। আমার অবর্ত্তমানে এ সমস্ত বিষয়ই যখন তোমাদের, তখন আর আমি ও সকল বিষয়ে আপত্তি করিব কেন?"

হরশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি সেইদিনেই তাঁহার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, হরশঙ্করের কথা শুনিয়া তিনিও সেই সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্রের বাড়ীটী প্রকাণ্ড, দ্বিতল ও দ্বিমহল। বাড়ীর স্ত্রীলোকের মধ্যে রাধারাণী ও চারুশীলা, অন্দর মহল ছাড়িয়া, তাঁহারা বহির্বাটীতে আসিতে পারেন না। হরশঙ্করের বন্ধুটীর নাম ভবানীপ্রসাদ— [illegible] রাত্রিকালেই আসিয়া উপস্থিত